Price : Rs.2/-

শাস্ত্রধর্ম প্রচার সভার বাঙলা মুখপত্র

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীমৎ শ্রীউপেন্দ্রমোহন

হরে নহ্যতো ভব মে শরণং ধর্মা বুদ্ধিং জগতঃ কুরুষ্ব। ধনদা নাশং বুদ্ধিপর্যায়ক সভা প্রবৃদ্ধিং সমনুপ্রযচ্ছ ॥

BHARATAJIRA

A weekly Bengali Magazine of Shastra Dharma Prachar Sabha

ভারতাজির

ভারতমেব অজিরং প্রাঙ্গণং বৈকুণ্ঠস্য

ভারতবর্ষই বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গণ।

৩য় খণ্ড   সংখ্যা   সাপ্তাহিক পত্রিকা

অহো অমীষাং কিমকারি শোভনং প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ।
যৈর্জন্ম-লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে মুকুন্দ-সেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ॥

যাঁহারা বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গণ ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্মলাভ করিয়াছেন, যে মনুষ্যজন্ম মুকুন্দ সেবার উপযোগী, আহা! ইঁহারা কি শুভ কর্ম করিয়াছেন। অথবা স্বয়ং হরি কি ইঁহাদের প্রতি প্রসন্ন? (শ্রীমদ্ভাগবতে দেবতাদের উক্তি)

কৃষ্ণানুগ্রহতো লব্ধ্বা মানবং জন্ম ভারতে।
ন ভজেৎ কৃষ্ণপাদাব্জং অলতাত্মবিড়ম্বনম্॥

শ্রীভগবানের অনুগ্রহে ভারতে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও মানুষ শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম ভজনা করেনা, ইহার তুল্য বিড়ম্বনা নাই।

অন্যস্থানে বৃথা জন্ম নিষ্ফলং চ গতাগতম্।
ভারতে চ ক্ষণং জন্ম সার্থকং শুভকর্মদম্॥

ভারতে ক্ষণমাত্র জন্মও সার্থক ও কল্যাণপ্রদ। অন্যত্র জন্ম বৃথা, সেখানে যাতায়াতই সার।

সংপ্রাপ্য ভারতে জন্ম সৎকর্মসু পরাঙ্মুখঃ।
পীযূষকলসং হিত্বা বিষভাণ্ডং স ইচ্ছতি॥

ভারতে জন্মলাভ করিয়াও যে নিজের কল্যাণ চাহে না সে অমৃতকলস ত্যাগ করিয়া বিষভাণ্ড অবলম্বন করে।

জয়ন্তি শাস্ত্রাণি দ্রবন্তি দাম্ভিকাঃ। হৃষ্যন্তি সন্তো নিপতন্তি নাস্তিকাঃ।।

গুরু ও ভগবচ্চরণে সমর্পিত সকলের শাস্ত্রনিষ্ঠ জীবন আগামী বর্ষে আরও সুখ-শান্তি-কল্যাণময় হোক। —*ভাঃ সঃ*

দুখ যে মা দয়া তব

মাগো তুষ্ট হও যবে সর্ব্বরোগ নষ্ট ভবে
রুষ্ট হ'লে ইষ্টনাশ হয়।
তোমার আশ্রয় নিলে বিপদ নাহিক' মিলে
অপরের হয় সে আশ্রয়।।

মাঁ! তোমার স্নেহ, তোমার করুণার অমর্যাদা ক'রে, তোমার অনীপ্সিত পথে চ'লে যে মহা অপরাধ করেছি, তার জন্য শাসন ও দণ্ড দিতেই তুমি ইচ্ছা করেছ। বিশ্বব্যাপী মহামারীতে তাই জনজীবন রুদ্ধ স্তব্ধ। মাঁ, এ তোমার করুণা; Corona নিগ্রহকে আমরা সেই দৃষ্টিতেই দেখবো। তবে মাঁ, তুমি ছাড়া আর কে আমাদের রক্ষা করতে পারে? তোমার পায়ে প'ড়ে ব্যাকুল প্রার্থনা জানাচ্ছি— মাঁ, আমাদের ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, ক্ষমা করো মা।

সুপ্রসন্ন হও মাতঃ হে দেবি শরণাগত-
জনগণ-আর্ত্তি-বিনাশিনী।
এ বিশ্ব চরাচর রক্ষা কর' নিরন্তর
তুমি বিশ্ব-রক্ষা-বিধায়িনী।।

মাঁ, প্রার্থনার সঙ্গে তোমার আনুকূল্যের সংকল্প এবং প্রাতিকূল্যের বর্জ্জনও করবো। অনুকূল জীবনচর্যা, নামসংকীর্ত্তন, নামজপ মন্ত্রজপ সৎসঙ্গ ছাড়াও নিজের জীবিকা ও বৃত্তিকে তোমারই পূজা মনে ক'রে সুচারু ও পরিপাটীরূপে সব কাজ করবো যেমনটি গীতায় বলেছ— **স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ**। আমার মন বুদ্ধি ও শরীরকে সদা নিযুক্ত করবো তটস্থ হ'য়ে প্রতীক্ষা করতে, শুধু জানতে, কিসে তোমার সন্তুষ্টি হয়।

আর প্রাতিকূল্যবর্জ্জনের জন্য নিরন্তর চেষ্টা করবো বুঝে নিতে— **আমিই আমার পরম শত্রু**। কারণ আমার খেয়ালখুশীতে চলতে গিয়ে তোমার মতো করুণাময়ী মাঁ-রও রোষ উৎপন্ন করেছি। এ যে তোমার মর্ম্মান্তিক কষ্ট মাঁ! তাই অসৎসঙ্গ সম্পূর্ণ বর্জ্জন করবো। খবরকাগজ টিভি বৃথালাপ আলস্য প্রভৃতির মাধ্যমে সময় নষ্ট আর করবোনা। চা বিড়ি সিগারেট প্রভৃতির নেশা তো ছাড়বোই, সিনেমা-খেলাধূলো প্রভৃতি ভগবৎ-সম্পর্কহীন মনোরঞ্জনে আর আকৃষ্ট হবোনা।

মাঁ আমাদের দৌড় তো তুমি জানোই। আমাদের প্রয়াসে না কুলোলে তোমার প্রসাদ দিয়ে ভরিয়ে দাও মা!

খল ও দখল

মা! তোমার ঋষিদের ও তাঁদের যজমানদের বংশধররা, অর্থাৎ ভারতবর্ষবাসী হিন্দুরা সঙ্গদোষে চরিত্র হারিয়েছে। আর সে সঙ্গ তো এক-আধ দিনের নয়, শতাব্দীর পর শতাব্দী খলের দখলে প'ড়ে। দখল করে খল। সে নিজলাভে সন্তুষ্ট নয়। অন্যের বাসভূমি সংস্কৃতি জীবনশৈলীর স্বাতন্ত্র্য সে দখল করতে চেয়েছে, দখল করেওছে। খৃষ্টধর্ম্মের প্রসার তরবারির মাধ্যমেই হয়েছে, যীশুর মহাজীবন মহামরণ ও তাঁর সূক্তির মাধ্যমে মনজয় ক'রে হয়নি। রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে ইসলামের প্রসারের ইতিহাসও তাই। স্বাধীনতা-সাম্য-মৈত্রীর প্রতিষ্ঠা করবার ভাবনাটি ললিত ও স্তুত্য, কিন্তু তা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বিপুল রক্তপাত ঘটালো খৃষ্টানরা— এ যেন পথে নেমে পথ হারানোর মতিভ্রম।

গত ২০০০ বছরের ইতিহাস মানেই এমনতর বলপূর্ব্বক ভূমিদখলের ও সংস্কৃতিদখলের রক্তাক্ত ইতিহাস— বিশেষ ক'রে গত ৫০০ বছরে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় আফ্রিকায় অস্ট্রেলিয়ায় এবং এসিয়ায় উপনিবেশ স্থাপনে ঐ রক্তাক্ত ইতিহাসেরই কলংকময় অনুবর্ত্তন।

নতুন অর্থনৈতিক ভাবনাতেও লোভই চালিকাশক্তি। কোনও বস্তুলাভের জন্য জনগণকে প্রলুব্ধ করতে হবে। জনগণ প্রলুব্ধ হ'য়ে তা পেতে চাইলে তাকে তার লোভ মেটাবে বিক্রেতা, অর্থের বিনিময়ে। ভোগ্যপণ্যের জন্য ক্রেতার লোভ, এবং ক্রেতাকে তা জুগিয়ে দিতে অর্থগৃধ্নু বিক্রেতার টাকার লোভ— অর্থনীতির এটিই প্রাণ। ভোগ ও লোভ এইভাবেই সারা বিশ্বে ব্যাপ্ত হচ্ছে। তাই অরণ্যধ্বংস, জলাভূমির অপব্যবহার ও জীববৈচিত্র্যের ধ্বংসসাধনে মানুষ দিশাহারা। মানুষের বুভুক্ষা বিলাস ও প্রসাধনের জন্য

নানাপ্রকার জীবজন্তুর মাংস হাড় চামড়া দাঁত একান্ত প্রয়োজন হিসাবে দেখা দিয়েছে। সুখভোগের মত্ততায় আকরিক ধাতু এবং ইন্ধন উত্তোলনের জন্য চলছে বিস্তৃত ভূমির ওপর যান্ত্রিক অত্যাচার। এইজন্য এই সব অঞ্চলবাসীরা বাস্তুহারা হলেন, কিন্তু বস্তু পেলেননা।

কিছু চিন্তাশীল মানুষ, নিসর্গের ও বিশ্বপ্রকৃতির এমন পৈশাচিক দোহনে ও শোষণে উদ্বিগ্ন হয়েছেন, সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু বিপদ আসন্ন বুঝেও সতর্ক হওয়ার প্রবৃত্তি হয়নি মানুষের। এই ভোগোন্মত্ততা, বনচর ও জলচর পশুপাখী ও কীটপতঙ্গদের থাকার জায়গা অত্যন্ত সংকুচিত করায়— আজ সারা বিশ্বে যে দূরত্ব বজায় রাখার কথা নিরন্তর সোচ্চারে বলা হচ্ছে— তা মর্ম্মান্তিক ভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে। তাই একটু একটু ক'রে পশুদের থেকে নানা রোগ মানুষে সংক্রামিত হয়েছে। তাই সম্প্রতিকালে HIV, ইবোলা, নিপা, মারবুর্গ, মের্স্, লাসাজ্বর, সার্স, জিকা, West Nile মহামারীরূপে বহু লোকক্ষয় করলেও, এসব রোগের উৎস বানর বাদুড় শুয়োর উট ইঁদুর ও পাখী জানতে পারলেও, আমাদের সম্বিৎ ফেরেনি, আমরা পশুদের বাসস্থান দখল করেই রইলাম। এই দখলদারির বিরুদ্ধেই মোক্ষম প্রতিবাদ Corona virus এর আক্রমণ। সারা বিশ্ব এই মহামারীর আক্রমণে এবং প্রকোপে আতংকিত, রুদ্ধ ও বদ্ধ। মৃত্যুর মিছিল গণনাই এখন তার রোজনামচা।

বিশ্বব্যাপী lockdown ও সবাইকে অন্তরীণ করার পরেও ভাবনাতীত লোকক্ষয় ক'রে এই জৈবপ্রতিবাদ কবে শেষ হবে, বিজ্ঞানীরা তা বলতে পারছেননা। কিংবা এর পরে আরও ভয়ংকর মহামারী আসবে কিনা, তাও তাঁরা বলতে পারছেননা। যদি সে মহামারী আসে তবে শেষের সেদিন হবে ভয়ংকর। তাহ'লে উপায়?

* প্রথম উপায় হবে— যাঁর ইচ্ছা ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়েনা, সেই শ্রীভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ ও নিরন্তর ক্ষমাভিক্ষা। পরবর্ত্তী উপায় হবে—

* যে শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য এই দণ্ড নেমে এসেছে, সেই শৃঙ্খলায় ফিরে যাওয়া, নগরায়ণ কমিয়ে গ্রাম্যজীবন অঙ্গীকার এবং ব্যাপকভাবে অরণ্যসৃজন ও পরিবেশদূষণ কমাবার সার্ব্বিক প্রয়াস।

(আজকার গ্রাম হবে smart village– কোনও জলাশয় বা নদীর ধারে গাছগাছালির শ্যামলিমার মধ্যে পরিকল্পিত গ্রাম— নতুন নির্ম্মাণ কিংবা যেগুলি আছে সেগুলিকেই পরিকল্পনা অনুযায়ী গুছিয়ে নেওয়া, অবশ্যই পরিবেশদূষণের অবিরোধে। বিদ্যুৎ, নলবাহিত জল, ব্যাংক, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল এর পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্র, ফলের বাগান, গোশালা, কামারশালা ছাড়াও থাকবে কুমোর ময়রা স্যাকরা মালাকারদের শিল্পপ্রতিষ্ঠান। রাজধানী শহর বা তার চার দিকে উপগ্রহনগরী বা জেলাসদরের সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে কিন্তু নির্ভরতা কমিয়ে প্রত্যেকটি গ্রামকে স্বয়ংনির্ভর করা থাকবে লক্ষ্য। শহরে নগরে সদরে বস্তি উচ্ছেদ ক'রে বস্তিবাসীদের এই নব্যশ্যামল গ্রামগুলিতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ক'রে জনবসতির ঘনত্বে সামঞ্জস্য আনতে হবে— সুস্থ জীবন, স্বাধীন বৃত্তির লক্ষ্যে। দুইটি পাশাপাশি গ্রামের মধ্যে অরণ্যসৃজন করা যাবে। গ্রামপঞ্চায়েত স্থির করবে একাধিক গ্রামের সঙ্গে তাদের সমবায় সংগঠন করার ব্যাপারে।)

* প্রকৃতিব্যবস্থিত ভোগ থাকুক, ভোগোন্মত্ততা বন্ধ হোক।

* WHO নির্দ্দিষ্ট দৈহিক দূরত্ব রক্ষার জন্য, স্ত্রীলোকরা নিজ নিজ গৃহে অন্তরীণ হ'ন, গৃহ থেকেই কাজকর্ম্ম করুন।

* সংগঠিতভাবে পশুপালন নিধন ও তাদের মাংস রক্ত চর্ব্বি অস্থি ও চামড়ার ব্যবসা সারা বিশ্বে নিষিদ্ধ হোক।

সারা বিশ্বে সব কসাইখানা নিষিদ্ধ হোক।

* স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বিচার, শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার, উচ্ছিষ্ট বিচার, জলশুদ্ধি, অগ্নিশুদ্ধি ও গব্যশুদ্ধির উপকারিতা ভারতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোক; এবং বিশ্ববাসী সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে উপকৃত হোন।

* তিব্বতকে দালাই লামা-র হস্তে, অধিকৃত কাশ্মীর ভারত সরকারের হস্তে অবিলম্বে প্রত্যর্পিত হোক। এতাদৃশ যে সব অঞ্চল, বিশ্বের নানা প্রান্তে, দখলদারদের দখলে রয়েছে, সেগুলিরও যথাযথ প্রত্যর্পণ হোক।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষ যেমনটা ভাবে, সেটাই তার মজ্জাগত মনোগতি, বদ্ধমূল সংস্কার। আজ বিশ্বব্যাপী এমন মৃত্যুমিছিলে, ভারতসরকার যেমন প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির— এমনকি সুদূরস্থিত একাধিক বিপন্ন রাষ্ট্রের স্বার্থের কথা

ভেবেছে; একা নয়, সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে বাঁচবো-চলবো-ভাববো-র ভাবনা ছড়িয়ে দিয়ে বিশ্বনন্দিত হয়েছে, এটা হিন্দুচেতনারই প্রকাশ; ঋগ্‌বেদে উচ্চারিত **"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্"** মন্ত্রেরই জীবন্ত আচরণ। হিন্দু প্রকৃতপক্ষে আজ অলীকহিন্দুতে অধঃপতিত হলেও, তার হৃৎস্পন্দনে আজও যে বৈদিকভাবনার তাল ও লয় চলছে, এ বিশ্ববিধাতার করুণার দান। Corona এ করুণাপ্রবাহ স্তব্ধ করতে পারেনি।

তবে এ ভাবনা Macro স্তরে অর্থাৎ রাষ্ট্রস্তরে; Micro স্তরে নাগরিকস্তরে, খোদ এই হিন্দুদের দেশে, এমন ঐক্যভাবনার বিপরীত ব্যাপারটা দেখে না কেঁদে পারা যায়না। যে শ্রমিক তার বাপ-মা ছেলে-বৌ ঘরে রেখে দূ....উ-রে এক ভিন্ন প্রদেশে গিয়েছিল একটু বেশী রোজগারের আশায়, এবং একটু একটু ক'রে সঞ্চয় বাড়িয়ে সকলকার মুখে হাসি ফোটাচ্ছিল বছরে বছরে, আজ সে lockdown -এ আটকে পড়েছে। সব বন্ধ। মালিকের কারখানা, খামার সব বন্ধ। সে শ্রমিককে ছাঁটাই করেছে, বলেছে এই বন্ধ অবস্থায় মজুরি দিতে সে অসমর্থ। শ্রমিকের হাতে যা ছিল, তা শেষ হ'লো ব'লে। এমন অগণিত শ্রমিক কোনও কোনও জায়গায়, আর থাকতে না পেরে জড়ো হয়েছে, হাজারে হাজারে। চেয়েছে পায়ে হেঁটেই নিজের গ্রামে ফিরতে। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন, লাঠি পেটা করেছে তাদের, কারণ এখন lockdown, দূরত্ব বজায় রাখাই প্রয়োজন; শ্রমিকরা তা করেনি।

প্রশাসনকেও দোষ দেওয়া যায়না, কারণ সংবাদপত্রে, বিহার ও উত্তরপ্রদেশ সরকার বিশাল বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আটকে পড়া বিহারী ও উত্তরপ্রদেশবাসী নাগরিকদের lockdown অবস্থায় নড়াচড়া না ক'রে তাঁদের প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য টেলিফোনে (নম্বর বিজ্ঞাপনে দেওয়া হয়েছে) যোগাযোগ করতে নির্দ্দেশ দিয়েছেন, জানিয়েছেন প্রাদেশিক সরকার তাঁদের জন্য সদা চিন্তিত ও সমস্যাসমাধানে উদ্‌যুক্ত। অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারগুলিও এমন বিজ্ঞাপন দিয়েছে হয়তো।

তবু, সুস্থচিন্তা তদনুরূপ কার্যে প্রতিফলিত হয়নি। কী যেন একটা পক্ষাঘাত তা করতে দেয়নি। সরকারি ত্রাণকোষে হাজার হাজার কোটি টাকা জমা পড়েছে এবং তার সদ্‌ব্যবহার হ'তে শুরু হয়েছে, তবু কয়েকলক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকের আতংক কাটেনি।

কোথায় গেলেন ডঃ প্রবীণভাই টোগাড়িয়া যিনি ২০০১ এর কচ্ছ-ভূমিকম্পে বিপর্যস্ত গুজরাতে, দেশবিদেশ থেকে আগত ত্রাণসামগ্রীর সুষ্ঠুবন্টন এ বিপন্নদের পরিত্রাণ ক'রে এক আদর্শস্থাপন করেছিলেন ?

কোথায় গেলেন অজয় ডাগা যিনি কলকাতার গড়ের মাঠে গাড়োয়ানদের ছেড়ে দেওয়া শতাধিক ক্ষুধার্ত্ত ঘোড়ার খাদ্য জুগিয়ে দেন একান্ত মমতায় ?

কোথায় গেলেন সন্ত মুরারি বাপু যাঁর অঙ্গুলিহেলনে আম্বানীদের মতো ধনাঢ্য পরিবার লক্ষ মানুষের ক্ষুধানিবৃত্তি করতে সমর্থ ? অথচ তার কোনও লক্ষণই চোখে পড়ছেনা তো !

বিহারের সুলতানগঞ্জ থেকে গঙ্গাজল আহরণ করার পরে বৈদ্যনাথধামে যাওয়ার পথে, শ্রাবণমাসে যে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী গঙ্গাজল বহন ক'রে চলেন, পথের ধারে বাস করা সহস্র সহস্র পরিবার এঁদের যেচে আতিথ্যদান ক'রে পথক্লান্তি দূর করেন, ভোজ্য ও পানীয় দিয়ে ক্ষুধা পিপাসা দূর করেন, ভক্ত পুণ্যার্থীদের পাদসংবাহন ক'রে তাঁদের ক্লেশ দূর ক'রে কৃতার্থ বোধ করেন। এমন আর্ত্তসেবার মনোভাব এই পরিযায়ী শ্রমিকদের কাছে দুর্লভ কেন ?

সেবা কি কেবল সংগঠিতভাবেই সম্ভব ? হয় সরকারি, নয়তো রামকৃষ্ণ মিশনের কিংবা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ? পাশের বাড়িতে আগুন লাগলে তো দমকলের জন্য অপেক্ষা করিনা। ঘটী বাটি বালতিতে জল নিয়ে নিভোতে লেগে যাই। সামর্থ্যানুযায়ী।

আজ এই স্বতঃস্ফূর্ত্ত সেবা বা তার আগ্রহের অভাবে দুঃখই হয়। তবে আধুনিক জগতে সহানুভূতির এমন অভাব ভবিতব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ দেশে দেশে সব সরকার Welfare state বা কল্যাণরাষ্ট্র ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ায় জনকল্যাণের দায়িত্ব সরকারই গ্রহণ করেছে। তাই নাগরিকদের সরকারের ওপরেই নির্ভরতা বেড়েছে, এবং তারই সঙ্গে কমেছে আপনজনদের ওপর নির্ভরতা। এতে পরিবারবন্ধন কেবল শিথিল হয়নি, ছিন্ন হওয়াই যেন নিয়ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

ভারতবাসীও এই ধিক্কারযোগ্য পথ অবলম্বন করে নিজের সংস্কার ও ভবিষ্যৎ না হারায়, এই প্রার্থনা।

আচার নয়, যৌথ যাপন

অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

নরেন্দ্র দেবের প্রয়াণের পরে ক্রিয়াকর্ম করছেন কন্যা নবনীতা দেব সেন। পৌরোহিত্যে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি মন্ত্র উচ্চারণ করতেই অবাক নবনীতা ঃ 'এ যে গায়ত্রী, কাকাবাবু। আমি একেই অব্রাহ্মণ, তায় নারী।' ধমক ভাষাচার্যের, 'যে মানুষ বেদ উপনিষদ পড়েছে, মন্ত্রের মানে যে বোঝে, যার জীবনধর্ম হচ্ছে অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা— তাকে গায়ত্রী পড়াব না? পড়াতে হবে কোনও নিরক্ষর ভূতকে, যে ঘটনাচক্রে ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মেছে?'

ঘটনা দুই ঃ মালদহের হবিবপুরে স্কুলে সরস্বতী পুজোর দায়িত্বে ছিলেন রোহিলা হেমব্রম।

নারীর পৌরোহিত্য নিয়ে তর্ক, বাধা, এমনকি 'লিবারাল' অভিনন্দন— হিন্দু পরম্পরার নিরিখে এ সবই আসলে অপ্রাসঙ্গিক। কারণ, বিয়ের বহু মন্ত্রেরই রচয়িতা এক নারী, ঋষি সূর্যা। পাশাপাশি, স্মৃতিকার যমের সাক্ষ্য,

'পুরাকল্পে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনম্ ইষ্যতে।
অধ্যাপনং চ বেদানাং সাবিত্রীবচনং তথা।।'

বেদ-পাঠের পাশাপাশি উপনয়নও হত নারীর।

আবার প্রচলিত দৃষ্টিতে বৈধব্য হিন্দু নারীর পালনীয় সংস্কার। কিন্তু বেদের যুগে স্ত্রীর মৃত্যু হলে যজ্ঞের অধিকার হারাতেন স্বামী। বৈধব্য স্বামী বা পুরুষেরও পালনীয় 'সংস্কার' যে! অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম গোড়া থেকেই সর্বাধিকারের পরিসর তৈরি করেছে।

এই বিষয়গুলি দিয়ে নান্দীপাঠের কারণ, হিন্দুধর্মের কাঠামো, 'শাস্ত্র' অস্বীকার করে প্রচলিত আচার, সংস্কারের বাঁধনকে। এই অস্বীকারের শক্তি নিহিত সর্বাধিকার দান, সর্ব-গ্রহণ ও সর্বায়ত, এই ত্রি-চেতনায়। এই চেতনা এক নয়, বহুর কথা বলে। সর্বগ্রহণ চেতনা তৈরি হয় অধ্যাত্ম বা সামাজিক কারণে। কখনও বা দু'টি কারণ একত্রে কাজ করে। বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছিলেন, 'ঋগ্‌বেদ'-এর সময়ে আর্য-অনার্য সংমিশ্রণ ঘটেছিল ('কৃষ্ণচরিত্র')।

সম্প্রতি শিব-চিত্র কেমন হওয়া উচিত, তা নিয়ে যুদ্ধ বাধে নেট-নাগরিকদের মধ্যে। অথচ শিবই সম্ভবত বঙ্কিম কথিত সংমিশ্রণেরই শ্রেষ্ঠ প্রতীক। আর্যদের আগমনের আগেই শিবের আরাধনা প্রচলিত ছিল ভারতে। রাম-রাবণের যুদ্ধ, কিরাতরূপী শিবের কাছে অর্জুনের হার প্রভৃতি 'ঘটনা' বা আখ্যানকে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সংঘাত হিসেবে দেখেন বহু তাত্ত্বিক। কিন্তু পাশাপাশি দু'টি জাতি থাকলে সম্বন্ধও অনিবার্য। অতএব আর্যের ঘরে গৃহিণীদের সূত্রে ঢুকে পড়লেন তাঁদের পিতৃকুলের আরাধ্য শিব ('বামন পুরাণ'-এ আখ্যান রয়েছে এ নিয়ে)। শিব আর্যেরও দেব হলেন। তাঁর আর এক নাম হল রুদ্র। রুদ্র বৈদিক দেবতা। 'ঋগ্‌বেদ'-এ শিব শব্দের ('৭/১৮/৭') উল্লেখ আছে, কিন্তু দেব নয়, জাতি অর্থে। ঋষি অরবিন্দের মতে, শব্দটির ব্যবহার 'সদাশয়', 'শুভ' প্রভৃতি অর্থে। শিব সৃষ্টির প্রতীক, রুদ্র ধ্বংসের। রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ব্রহ্মায় আর্যসমাজের আরম্ভকাল, বিষ্ণুতে মধ্যাহ্নকাল এবং শিবে তাহার শেষ পরিণতির রূপ রহিল।' ('ইতিহাস')

অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম বলতে আজকে আমরা যা দেখি, আসলে তার পরম্পরায় আশ্রিত বৃহত্তর সমাজ। এই পরম্পরাতেই বিস্তার সর্বায়ত চেতনার। আধুনিক ভারতের নানা প্রান্তে জাতের নামে বজ্জাতি, খুনোখুনির অভিযোগ সামনে এসেছে বারবার। শরীরের আকার-বর্ণ নিয়ে ব্যঙ্গ করার ঘৃণ্য প্রবৃত্তি পথে-নেটে দেখা যায়। মানসিক-হাসপাতাল 'থিম' হয় পূজোয়, মেলায়। কিন্তু 'যজুর্বেদ'-এর যজ্ঞে দেখা যায়, মানসিক ভারসাম্যহীন, চণ্ডাল, মোটা, অতি কৃষ্ণ গাত্রবর্ণ-সহ নানা ধরনের মানুষের উপস্থিতি। যৌথ-সমাজের এই ভাবনার জন্যই 'মৈত্রেয় উপনিষদ' তাই জানায়, 'মানবদেহই যথার্থ দেবালয়।' ধর্মের নামে সেই দেবালয় নিগ্রহ করে যে আচার, সেই সাধনা আদরে ভস্মে ঘি ঢালা ('ভাগবত')। মনে পড়ে ক্ষিতিমোহন সেনের মোক্ষম কথাটি, 'এইসব আচার বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের মতামতে ততটা ধরা পড়ে না যত ধরা পড়ে প্রাকৃতজনের সংস্কার দেখিলে।' ('হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ')

এই প্রাকৃতজনের সংস্কার, তার সাহিত্য-শিল্পের পরিসরটিকে হিন্দু ধর্মের ত্রি-চেতনার উদাহরণ হিসেবে পড়া যায়। গোড়ায় বলে রাখা 'ভাল', ইসলাম ধর্মাবলম্বী শাসকের ভিন্‌ধর্মাবলম্বীদের উপর 'অত্যাচার'-এর বহু নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু সেই শাসকই ভিন্‌ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা

করছেন, এমন উদাহরণও রয়েছে। পাশাপাশি, জনের ভাবনায় শাসকের অধিকার যে সামান্যই, তা-ও দেখা যায়। তাই সপ্তদশ শতকের শেষে বাংলার পিরপাঁচালিতে বৌদ্ধ ধর্মঠাকুর, মুসলিম পির, হিন্দু নারায়ণের অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখেন সুকুমার সেন। কবি ফৈজুল্লার সত্যপিরের পাঁচালিতে বলা হয়, 'তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি নারায়ণ/ শুন গাজী আপনি আসরে দেহ মন।' আবার পূর্ব ভারতে বহু হিন্দু কবি রাম ও রহিম, উভয়কে বন্দনা করে পাঁচালি লেখেন।

পাশাপাশি, আকবরের আমলে চার চিত্রশিল্পীর নাম জানান আবুল ফজল ঃ জুদ্দী, খাজা আব্দুস সামাদ, যশোবন্ত এবাং বাশাওন। শেষোক্ত দু'জন ধর্মে হিন্দু। অর্থাৎ চিত্রশিল্পেও 'সনাতনি' ও ইসলামি শিল্প এবং শিল্পীর মেলবন্ধন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

সম্প্রতি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের শিক্ষক হিসেবে ইসলাম ধর্মাবলম্বী ফিরোজ খানের নাম সামনে আসতেই বিক্ষোভ হয়। অথচ, দরাফ খাঁ সংস্কৃতে রচনা করেছিলেন 'গঙ্গাষ্টক' বা গঙ্গাস্তোত্র! কিছুদিন আগে দিল্লিতে মুসলিম পড়শিদের বাঁচিয়ে নিজে দগ্ধ হয়েছিলেন প্রেমকান্ত বাঘেল। প্রেমকান্ত হিন্দু ধর্মের সারকথাটি বুঝেছেন স্ব-অভিজ্ঞতায়। কথাটি শান্তিপর্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকেও বুঝিয়েছিলেন ঃ মানুষের থেকে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নয়।

সম্পাদকের সংযোজন ঃ

(১) পাগল যা ভাবে, তাই বলে। বারবার বলে। তার মনে-মুখে মিল আছে ভেবে কেউ যদি তাকে গুরুপদে বসায়, পাগলের কথায় চলতে যায় তবে তাকেও আমরা পাগলই বলবো।

কিন্তু সেয়ানা পাগলকে কেউ গুরু মনে ক'রে বসলে তার কেমন অবস্থা হবে তার দৃষ্টান্ত অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর প্রবন্ধটি।

(২) অর্ঘ্য বিধবা ও বৈধব্য নিয়ে অনেক কথা লিখেছেন। কবি নরেন্দ্র দেব **মাতৃবৎ পরদারেষু** নীতিটি বিসর্জ্জন দিয়ে অন্যের বিধবার গর্ভে যে নবনীতার জন্ম দিয়েছেন সে বিষয়ে নীরব কেন?

(৩) আধুনিক পুরোহিতদের অনেকেই অসবর্ণ বিবাহে পৌরোহিত্য করেন। নরেন্দ্র দেব এবং তাঁর কন্যা নবনীতার কথা জেনে এমন পিতার শ্রাদ্ধকর্ম্মে কন্যার পৌরোহিত্য করতে কি পুরোহিতরা আসতে চাননি? সেজন্যই কি ভাষাচার্য্যকে পৌরোহিত্য করতে হ'লো?

(৪) ব্রাহ্মণশরীর এবং সংস্কৃতভাষায় ভালো জ্ঞান থাকলে ভালো পুরোহিত হওয়া যায়। তবে এ দুটিই যথেষ্ট নয়, পুরোহিতকে হ'তে হয় সদাচারী, নির্লোভ, পৌরোহিত্যকর্ম্মের উৎকর্ষসাধনে নিরন্তর যত্নশীল এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মকে পাপজনক এবং ব্যর্থ জেনে, সে কর্ম্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখা তো বটেই, যজমানদেরও অমন পাপজনক কর্ম্ম বর্জ্জন করার উপদেশদান।

ভাষাচার্য্যের কেবলমাত্র প্রথম দুটি সম্পদ ছিল।

(৫) মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে উক্ত হয়েছে "স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু"— ৬৪ কলায় গুণবতী স্ত্রীলোক ৺মা জগদম্বারই এক বিভূতি। সুতরাং নবনীতার জন্মদোষ থাকলেও তাঁর গুণপনার বিচারে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে। আবার সেই গুণাবলী ভগবদ্‌বিরোধী কার্য্যে প্রযুক্ত হওয়ায় আমরা তাঁর সেই কার্যাবলীকে নিন্দাও করেছি।

(৬) ভাষাচার্য ভাষার হাড়গোড় নিয়েই ব্যস্ত থেকেছেন, ভাষার প্রাণ যে ভাব, তার সন্ধান পাননি। তিনি তাই বলেন, **"কোনও নিরক্ষর ভূতকে, যে ঘটনাচক্রে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেছে"**। মানুষের জন্ম ঘটনাচক্রে হয়, জন্ম accidental– এ ভ্রান্ত ধারণা ইহুদী-খৃষ্টান মুসলমানদের। বৈদিক ঋষিরা তা বলেননা। তাঁরা জেনেছেন কর্ম্মফল, জীবের বাসনা-সংস্কার এবং সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ গুণত্রয়ের প্রভাবে মানুষের জন্ম হয়। যার যেমন কর্ম্ম-সংস্কার-গুণত্রয় তার তেমন বর্ণ। সৃষ্টিপ্রবাহে জড়বস্তু অপেক্ষা চেতনবস্তু উৎকৃষ্ট। চেতনবস্তুর মধ্যে স্থাবর প্রাণীর চেয়ে জঙ্গম প্রাণী উৎকৃষ্ট। বুদ্ধিমান প্রাণীর মধ্যে মানুষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

(৭) ভাষাচার্য, ব্রাহ্মণসন্তান হ'য়ে ব্রাহ্মণসুলভ বিদ্যার্জ্জন ও বিতরণকার্য যা করেছেন তাতে তিনি বিশ্ববিখ্যাত এক ভাষাবিদ্। কিন্তু বিদ্যা যদি ভগবৎপাদ শংকরাচার্য্যের মণিরত্নমালা কথিত **"ব্রহ্মগতিপ্রদা"** হয় তবে তাঁকে অবিদ্যারই মূর্ত্তি বলতে আমরা বাধ্য হই। গোমাংস ভোজনে তাঁর রুচি

যেমন ধিক্কারযোগ্য, নবনীতার পিতৃশ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধকর্ত্রী নবনীতাকে গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করতে বলা তেমনই ধিক্কারযোগ্য।

নৃসিংহ-তাপনীয় উপনিষদে উক্ত হয়েছে—

সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মী স্ত্রীশূদ্রায় নেচ্ছন্তি....

যদ্যাচষ্টে স আচার্য্যস্তেনৈব স মৃতোঽধো গচ্ছতি ॥

গায়ত্রীমন্ত্র প্রণব বেদ ও শ্রীমন্ত্র স্ত্রী ও শূদ্রকে দিতে নাই, যে আচার্য্য স্ত্রী-শূদ্রকে এই সব মন্ত্র উপদেশ করিবেন তিনিও মৃত্যুর পরে যজমানের মতোই অধোগতি লাভ করিবেন। এমন নির্দ্দেশ তন্ত্রেও আছে।

(৮) অর্ঘ্য যখন লেখেন— "**বিয়ের বহু মন্ত্রেরই রচয়িতা এক নারী, ঋষি সূর্যা**" তখন বুঝতে পারি তিনি সেয়ানা পাগলের শিষ্য। সেজন্য তিনি জানতে পারেননি **ঋষয়ঃ মন্ত্রদ্রষ্টারঃ ন তু কর্ত্তারঃ** ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা, মন্ত্রকর্ত্তা বা মন্ত্ররচয়িতা নন। আদি ঋষি ব্রহ্মা বিষয়ে কথিত হয়েছে— **বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ**। সৃষ্টির ঊষাকালে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বেদস্মরণ করেন। বেদের আর এক নাম ব্রহ্ম। সৃষ্টির প্রলয় হলেও নিত্যনির্দ্দোষ শাশ্বত বেদের শব্দরাশি চিরকাল আছেন— নতুন সৃষ্টির সময় প্রথমে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার হৃদয়ে এবং পরে অন্যান্য ঋষিদের অন্তরে প্রতিভাত হন।

(৯) এর পরে নানা বাক্যজাল বিস্তার ক'রে অর্ঘ্য যেসব কথা লিখেছেন তা বিকৃত বিদ্যারই ফলশ্রুতি। যেমন—

(ক) আর্যদের বহির্ভারত থেকে আগমন।

(খ) আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সংঘাত।

(গ) শিবের দেবত্ব লাভ।

এ সব নিয়ে ভারতাজিরে বহুবার লেখা হয়েছে। তবু একটা কথা বলি— "আর্য" শব্দটি সংস্কৃতমূল, শব্দটি গুণবাচক, জাতিবাচক নয়।

কর্ত্তব্যমাচরন্ কর্ম্ম অকর্ত্তব্যমনাচরন্ ।

তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে স বা আর্য্য ইতি স্মৃতঃ ॥

—যিনি কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং অকর্ত্তব্য কার্য পরিহার করেন এবং যিনি সদাচারে প্রতিষ্ঠিত তাঁকে আর্য্য বলা হয়। কবিবর বাল্মীকি তাঁর রামায়ণে হনুমানকে আর্য্য বলেছেন।

(১০) বৃটিশ-অধিকৃত ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য বৃটিশ রাজশক্তির ইচ্ছায় "ভারতে আর্য্যদের আগমনের" গপ্পো ফাঁদা হয়েছিল। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল যুরোপীয় বিদ্বানদের সংস্কৃত সাহিত্যে ও বেদের ওপর গবেষণা। ম্যাক্সমূলার, ব্যাশাম, ভিন্টারনিৎজ, ম্যাকডোনেল, ওয়েবার পার্জিটার প্রভৃতি মনীষীরা বেদ চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু এই সব মনীষীরা সকলেই খৃষ্টান হওয়ার জন্য কতকগুলো **বদ্ধমনস্কতা**-র শিকার ছিলেন, যা বেদের প্রকৃত রহস্য তাঁদের বুঝতে দেয়নি। যেমন—

(ক) মনুষ্যদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গ মানুষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এমন ভ্রমাত্মক অহংকার।

(খ) স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক ও জাতি, পরাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক ও জাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এমন ভ্রান্ত ধারণা।

(গ) খৃষ্টীয় একেশ্বরবাদ, যা বহু দেববাদকে স্বীকার করতে চায়না। এও এক সীমাবদ্ধতা। (*বেদের একেশ্বরবাদে একেরই বহু নাম বহু রূপ বহু লীলা, বহু মন্ত্র, বহু রহস্য— যুগপৎ। যিনি কৃষ্ণ তিনিই দুর্গা। য়ুরোপীয় খুলিতে এ সত্য প্রবেশ করেনি। — ভাঃ সঃ*)

(ঘ) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাষা ছাড়াও ভাষার যে আরও তিনটি অবস্থা আছে— স্পন্দন জ্যোতি ভাব— এ বিষয়ে অজ্ঞতা। এবং

(ঙ) আহার ও বিহারে সদাচার ও পবিত্রতার অভাব।

অথচ এই মনীষীদের— আমরা যাঁদের সেয়ানা পাগল বলছি— বেদব্যাখ্যাই ইংরেজ সরকার ভারতের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজে ও স্কুলে পাঠ্য করে। বংকিমচন্দ্র, সুকুমার সেন, ক্ষিতিমোহন সেনরা সকলেই এমন অপব্যাখ্যার শিকার। ভারত স্বাধীনতালাভের পরও এঁদের অপব্যাখ্যা নিয়েই মেতে আছে। প্রবন্ধকার অর্ঘ্যও এমন অপশিক্ষারই শিকার।

(১১) অর্ঘ্য লিখেছেন— আচার নয়।

অথচ ঋষিরা বলছেন— **আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ**।

আচারহীনকে বেদও পবিত্র করতে পারেননা।

কঠোপনিষদেই (১/২/২৪) উক্ত হয়েছে—

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ ।

নাশান্তমানসো বাঽপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥

যে পাপাচরণ হ'তে নিবৃত্ত হয়নি, ইন্দ্রিয়লোলুপতা থেকে বিরত হয়নি, একাগ্রচিত্ত হয়নি, অলৌকিক শক্তিলাভকে যে তুচ্ছ মনে করেনা, তার পক্ষে কেবল প্রজ্ঞান বা মনীষার দ্বারা সত্যলাভ হয়না। ❐

From The Desk of Bharatajira Editor

R. N. 13792/57
RNI VOL 61

Postal Reg.No. KOL RMS/151/2016-2018

Wednesday
Vol. No. .No.

If undelivered please return to :

BHARATAJIRA
91, Chowringhee Road,
Kolkata-700 020

Subs No. :

To :

RNI VOL. 61 NO _BHARATAJIRA weekly Dated-
Subscription : Rs. 80.00 a year

OWNER : **SHASTRA DHARMA PRACHAR SABHA**, PRINTER : **SRI SANKAR SEN**, PUBLISHER : **SRI SANKAR SEN**, PUBLISHED FROM : **91, CHOWRINGHEE ROAD, P.S-BHOWANIPUR, KOLKATA - 700020** AND PRINTED FROM : **MARKSMAN MEDIA SERVICES, 21/A, RANI SHANKARI LANE, KOLKATA - 700026**, EDITOR : **SRI JOYNARAYAN SEN**, PH : **09432240230**

শাস্ত্রধর্ম প্রচার সভার পক্ষে শ্রীশঙ্কর সেন কর্তৃক ৯১, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-২০ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক মার্কসম্যান মিডিয়া সার্ভিসেস, ২১/এ, রাণী শঙ্করী লেন, কলিকাতা-২৬ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক—শ্রীজয়নারায়ণ সেন। প্রতি সংখ্যা ২ টাকা। চাঁদা বার্ষিক ৮০ টাকা অগ্রিম ৯১, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-২০ শাস্ত্রধর্ম প্রচার সভা-র নিকট প্রেরণ করিতে হয়। চেক পাঠাইতে হইলে "Shastra Dharma Prachar Sabha" র অনুকূলে করিতে হয়। দূরভাষ : **09432240230**